জাপানে বাংলাদেশ

গোলাম মোর্তোজা

চীনের গত তেরো বছরের ইতিহাসে যা হয়নি, এবার তাই হতে চলেছে। তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে যেতে পারে দুই শতাংশ। 'সার্স' আতঙ্কে চীনের অর্থনীতি এখন বিপর্যয়ের মুখে। হংকং, কানাডা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশগুলোও 'সার্স' আক্রান্ত। সার্স এমন একটি রোগ যার দ্বারা একটি দেশ আক্রান্ত হলে, পাশের দেশটির আক্রান্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ২৫ এপ্রিল সকাল ৯টায় জাপানের নারিতা এয়ারপোর্টে নেমে 'সার্স' আতঙ্কের সন্ধান পেলাম না, পথে ব্যাংককে যা দেখে গেছি। দেখলাম বিস্ময়করভাবে জাপান রয়ে গেছে 'সার্স' আতঙ্কমুক্ত। এটা কী করে সম্ভব? বুঝতে খুব বেশি সময় লাগলো না। জাপানিরা যা চায় না, সেটা হয় না। তারা যা চায় তাই হয়। তারা চায়নি তাই সার্স জাপানে ঢুকতে পারেনি। সার্স আতঙ্ক শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাপান তৎপর হয়েছে। জাপানের যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা চীনসহ বিভিন্ন দেশে পড়াশোনা করছে তাদের দেশে ফেরার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে জাপান সরকার। এছাড়াও নিয়েছে আরো কিছু পদক্ষেপ। যার প্রতিটি জিনিস অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে জাপানিরা। পুলিশ-সেনাবাহিনী দিয়ে তাদের বাধ্য করতে হচ্ছে না। সরকার শুধু সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে জাপানিদের। বাকিটা সাধারণ জাপানিরাই করছে। এটা শুধু এই ক্ষেত্রে নয়, প্রতিটি

সমুদ্রের নিচে সাড়ে নয় কিলোমিটার লম্বা টানেল দিয়ে সাত কিলোমিটার আসার পর পাঁচতলা হোটেল। এই হোটেলের চারতলায় দাঁড়িয়ে তোলা এই ছবিটি। সমুদ্রের নিচে দিয়ে টানেল উপর দিয়ে কয়েকতলা রোড সমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে হোটেল

ক্ষেত্রে। দেশের আইনের প্রতি সম্মান, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, তাদের আজকের এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে। আজকের জাপানিরা অন্যের ভুল-দোষ-ত্রুটি আছে বলে বিশ্বাস করে না। কোনো একটি ভুল হলে দায়টা সে নিজের মনে করে। একটি জাতির উন্নতির পেছনে কিছু কারণ থাকে। মেধা এবং যোগ্যতায় জাপানিরা পৃথিবীর যে কোনো দেশের চেয়ে এগিয়ে। পৃথিবীর অনেক জাতিই উদ্যমী এবং কর্মঠ। কিন্তু জাপানিদের মতো কাজ পাগল, উদ্যমী এবং সহনশীল জাতি খুব কমই আছে। জাপানিরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করে। পরচর্চা বা অন্যের বিষয়ে জানার বা উপদেশ দেয়ার অহেতুক কৌতূহলের ধারে কাছে তারা থাকে না। তাদের জীবনে সময়ের হিসাব সেকেন্ডের কাঁটায়।

নয়টার ট্রেন কয়টায় যায়- আমাদের সময় জ্ঞান নিয়ে এ জাতীয় অনেক মজার মজার গল্প আছে। আইন মানি না, সময় জ্ঞানশূন্য, উচ্ছৃঙ্খল ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হই আমরা। এই বিশেষণগুলো মিথ্যাও নয়। বিস্ময়কর হলেও সত্যি প্রবাসী বাঙালিদের জীবনে এসবের কোনো স্থান নেই। তাদের আইনের প্রতি সম্মান, সময় জ্ঞান, নিয়মানুবর্তিতায় প্রবাসী বাঙালিরা কোনো দিক দিয়েই পিছিয়ে নেই, জাপানিদের তুলনায়। বলা হয়, বাঙালিরা সিস্টেম মানে না। কথাটা সম্ভবত সত্যি নয়। আসলে আমাদের কোনো সিস্টেমই নেই, তাই মানার প্রশ্ন আসে না।

জাপানে আসার উপলক্ষটা ছিল 'বাংলাদেশ বৈশাখী উৎসব ১৪১০'। প্রতিবছর জাপান প্রবাসী বাংলাদেশীরা এই উৎসবের আয়োজন করেন। বাংলাদেশ সাংবাদিক লেখক ফোরাম, জাপান এবং ওৎসুবো ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণে জাপানে আসা। ডা. শেখ আলিমুজ্জামান, কাজী ইনসানুল হক, রাহমান মনি, আরিফ মাসুদ ববি প্রমুখ জাপান আসার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছেন। এরাসহ আরো অনেকের কারণে জাপান প্রবাসী বাঙালিদের কর্মযজ্ঞ দেখার সুযোগ হলো। ২৭ এপ্রিল টোকিওর ইকিবুকুরো'র নিশিগুচি পার্কে বসেছিল বৈশাখী মেলা। জাপানের সরকারি ছুটির দিন। প্রবাসী বাঙালিরা স্টল সাজিয়ে বসেছিল। পিঠা থেকে শুরু করে হরেক রকমের খাবার স্টলের পাশাপাশি বই, পত্রিকা, পোশাক সবকিছুরই উপস্থিতি ছিল মেলায়। টোকিও এবং আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাঙালিদের সপরিবারে আসা শুরু হয়েছিল সকাল থেকেই। দুপুরের পর থেকে মাঠ লোকে-লোকারণ্য। আয়োজকদের মতে সংখ্যা ছয় সাত হাজার। আমার মনে হয়েছে সংখ্যা চার থেকে পাঁচ হাজারের কম হবে না। মজার

বৈশাখী মেলার দুটি স্টল

ব্যাপার হলো- জাপানে বাংলাদেশীদের মোট সংখ্যা কত- এটা কেউ জানে না। বাংলাদেশ অ্যাম্বাসি থেকে শুরু করে কারো কাছেই এই পরিসংখ্যান নেই।

বৈশাখী মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জুয়েল এমকিউ-এর সাবলীল উপস্থাপনায় একটি চমৎকার দিন দ্রুত কেটে গেল। ইভা এবং আশিকের কবিতা পাঠ দিয়ে শুরু 'উত্তরণ' আর 'স্বরলিপি'র সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শেষ হলো অনুষ্ঠান। 'উত্তরণ' এবং 'স্বরলিপি' জাপান প্রবাসী বাঙালিদের দু'টি সাংস্কৃতিক সংগঠন। নানাকরম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তারা চালিয়ে যাচ্ছে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড।

প্রতিবছর বৈশাখী মেলা জাপানে পরিচিত করছে বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে। মেলা পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী ডা. শেখ আলিমুজ্জামানের বক্তব্যে রয়েছে আরো গভীরতা। তার মতে, 'আমরা শুধু বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে জাপানিদের সামনে তুলে ধরার জন্য এই মেলার আয়োজন করছি না। আমরা প্রবাসী বাংলাদেশীরা যে একটি সুশৃঙ্খল শক্তি- সেটা প্রমাণ করাটাই আমাদের মূল্য উদ্দেশ্য। আমরা উদ্যমী, পরিশ্রমী, শৃঙ্খলাপরায়ণ, কোনো রকম ক্রাইমের সঙ্গে জড়িত নই- এই বিষয়গুলো জাপানিদের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। কারণ এখন প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক জাপানি এই মেলায় আসে।'

ভাগ্যান্বেষণে প্রবাসীরা এসেছে জাপানে। অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় জাপানে বাংলাদেশীরা ভালো আছেন। বাংলাদেশীরা পরিশ্রমী, কাজ ভালো করেন- এমন সুনাম আছে জাপানিদের কাছে। জাপানের অর্থনৈতিক

অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ। ফলে বাংলাদেশীদের আয়ের পরিমাণ কমে গেছে। সংকুচিত হয়েছে কাজের পরিধি। তারপরও এখনো যা আছে সেটা অনেক ভালো। বাংলাদেশীদের মূল সমস্যা 'ভিসা'। অনেকে জাপানে ঢুকেছিল ছাত্র হিসেবে। জাপানি ভাষা শিক্ষা কোর্সে। ছাত্র থেকে চার ঘন্টা কাজের অনুমতি পাওয়া যায়। প্রায় সবাই যদিও আট ঘন্টা কাজ করেন। যত বেশি কাজ, তত বেশি অর্থ। এক পর্যায়ে স্কুল বাদ দিয়ে পুরোপুরি কাজে ঢুকে যান অনেকে। তারা হয়ে যান ভিসাহীন। আইনের চোখে যারা অবৈধ। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে নিশ্চিত দেশে ফেরত। যদিও জাপানের পুলিশ এখন অবৈধদের ধরার বিষয়ে মোটেই তৎপর নয়। তবে ভিসাহীন প্রবাসীদের মনে একটা ভয় হয়তো সব সময়ই থাকে।

অনেকে জাপানি বিয়ে করে স্থায়ী হয়ে গেছেন। তাদের কোনো সমস্যা নেই। জাপানি বিয়ে না করেও কেউ কেউ স্থায়ী নাগরিক হয়ে ব্যবসা করছেন। মাঝখানে একটা সময় জাপানে বাংলাদেশীদের আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভিসা পাওয়া যেত না বললেই চলে। সেই অবস্থার এখন কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। জাপান অ্যাম্বাসি এখন আবার স্টুডেন্ট ভিসা দিচ্ছে। স্টুডেন্ট ভিসায় আসা পনেরো-বিশজনের সঙ্গে পরিচয় হলো। তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ বিমানের একই ফ্লাইটে টোকিও যাচ্ছি। প্রতি সপ্তাহের ফ্লাইটেই নাকি এখন এরকম সংখ্যক বাংলাদেশী জাপানে যাচ্ছে। জেনে ভালো লাগল। কিন্তু তাদের থেকেই জানতে হলো মন খারাপ হওয়ার মতো খবরও। ভিসা পাওয়ার পুরো প্রক্রিয়ার জন্যে একেকজনের ব্যয় করতে হয়েছে দশ থেকে বারো লাখ টাকা। এর মধ্যে পুরো এক বছরের টিউশন ফি চার থেকে ছয় লাখ টাকা একবারে দিতে হয়েছে। নানা প্রক্রিয়ায় আরো কিছু অর্থ ব্যয় হয়েছে। সবাই একটি গুরুতর অভিযোগ করলেন বাংলাদেশের জাপান অ্যাম্বাসির বিরুদ্ধে। ভিসা পাওয়ার জন্যে নাকি আশি হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা দিতে হয়েছে জাপান অ্যাম্বাসির কিছু কর্মকর্তাকে। ব্যক্তিগতভাবে এই অভিযোগটি আমি বিশ্বাস করতে চাই না। আবার তাদের সবার এই অভিযোগ অবিশ্বাসও করতে পারি না। তাই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে অতি দ্রুত তদন্ত করে দেখা উচিত জাপান অ্যাম্বাসির। এমন হতে পারে হয়ত ইতিমধ্যে একটি সংঘবদ্ধচক্র গড়ে উঠেছে। যার সঙ্গে মূল দূতাবাসের হয়ত সম্পর্ক নেই। একমাত্র দূতাবাসই পারে বিষয়টি তদন্ত করে সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে। জাপান অ্যাম্বাসি যেহেতু ভিসার জন্যে কোনো অর্থ নেয় না, তাই তাদের বিরুদ্ধে এ রকম অভিযোগ

'বাংলাদেশে কাজ হয় খুব ধীর গতিতে'

ওসুমো ওৎসুবো
সভাপতি, ওৎসুবো ফাউন্ডেশন, জাপান

একটি জাপানি প্রতিষ্ঠান। প্রবাসী বাঙালিদের চিকিৎসা সেবাসহ নানারকম সহযোগিতা করে থাকেন।

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনি বাংলাদেশ সম্পর্কে কতটুকু জানেন?

ডা. ওসুমো ওৎসুবো : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই বাংলাদেশকে জানি। জানাটা ছিলো পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ, তার অনেক অর্থনৈতিক সমস্যা আছে এসব মোটামুটি জেনেছি। এছাড়া আমি বাংলাদেশে গিয়েছি অনেকবার। বাংলাদেশের রয়েছে গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। মানুষগুলো খুবই বন্ধুভাবাপন্ন।

২০০০ : আপনি বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন। এর কারণ কী?

ওৎসুবো : বাংলাদেশ একটি সুন্দর দেশ। বাংলাদেশের মানুষ ভালো। এরকম একটি দেশ এবং মানুষের জন্যে কিছু করতে চাই।

২০০০ : জাপানে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

ওৎসুবো : জাপান প্রবাসী বাংলাদেশীরা কঠোর পরিশ্রম করছে। তারা শান্তিপ্রিয়। সামাজিকভাবে এবং চিকিৎসা সুবিধার ক্ষেত্রে তারা কিছুটা অবহেলিত।

২০০০ : প্রবাসী বাংলাদেশীরা কী আপনার কাছ থেকে কোনো সুবিধা পেয়ে থাকে?

ওৎসুবো : অবশ্যই। আমরা প্রধানত বাংলাদেশীদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকি। সংস্কৃতি, শিক্ষা ক্ষেত্রেও আমরা কাজ করছি। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এ বছর আমরা 'বাংলাদেশ বৈশাখী উৎসব' আয়োজন করেছি। প্রথম দিকে এই মেলা আয়োজনের সব দায়-দায়িত্ব আমরা পালন করেছি। মেলায় আগত বাংলাদেশীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়েছি আমরা। আপনি দেখেছেন প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশী মেলায় এসেছে এবং চিকিৎসা সেবা নিয়েছে।

২০০০ : কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে কী ধরনের সহযোগিতা বা অসহযোগিতা পাচ্ছেন?

ওৎসুবো : সহযোগিতা নানাভাবে পাই...। তবে কাজ হয় অসম্ভব ধীর গতিতে। এটাকে হয়তো অসহযোগিতা বলা যায়। কর্মক্ষেত্রের কিছু মানুষের অসততা আমাকে মর্মাহত করেছে।

২০০০ : জাপানের বাংলাদেশ দূতাবাসের কার্যক্রম সম্পর্কে কতটুকু জানেন?

ওৎসুবো : আমাদের সংগঠনের কাজের ক্ষেত্রে দূতাবাস সহযোগিতা করে। তবে বাংলাদেশ দূতাবাসের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানি না।

'আমরা প্রবাসী বাংলাদেশীরা যে একটি সুশৃঙ্খল শক্তি- সেটা প্রমাণ করাটাই আমাদের মূল্য উদ্দেশ্য। আমরা উদ্যমী, পরিশ্রমী, শৃঙ্খলাপরায়ণ, কোনো রকম ক্রাইমের সঙ্গে জড়িত নই- এই বিষয়গুলো জাপানিদের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন'

ডা. শেখ আলিমুজ্জামান

ওঠারও কারণ থাকার কথা নয়। তারপরও যেহেতু অভিযোগ উঠেছে, সেহেতু তদন্ত হওয়া জরুরি।

জাপানে বাংলাদেশী ছাত্রদের পড়তে আসার বিষয়ে টোকিওতে কথা হয়েছিল জাপানি ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলের মালিক মি. সাতো কি সাও-এর সঙ্গে। জাপানে তার বেশ কয়েকটি স্কুল আছে। চীনে পাঁচটি, মঙ্গোলিয়াতেও একটি জাপানি ভাষা শিক্ষার স্কুল আছে তার। এখন বাংলাদেশে তিনি এরকম একটি স্কুল করতে যাচ্ছেন। যৌথ উদ্যোগে এই স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্যে জাপান প্রবাসী বাংলাদেশী ব্যবসায়ী ডায়মন্ড ট্রেডিং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহবুবুল হকের সঙ্গে ইতিমধ্যে আলোচনা অনেকদূর এগিয়েছে। আগামী জুন মাসে মি সাতো কি সাও-এর বাংলাদেশে আসার কথা। জাপানি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স দুই বছরের। দেশ থেকে এক বছরের কোর্স সম্পন্ন করলে আরেক বছরের কোর্স জাপানে গিয়ে করতে পারবে। মি. সাতো কি সাও-এর কাছে প্রশ্ন করেছিলাম এর ফলে বাংলাদেশীরা কতটা লাভবান হবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'বাংলাদেশে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে জাপান আসার একটা ব্রিজ তৈরি হবে। মঙ্গোলিয়া থেকে প্রতি ছয় মাসে একশ' জন ছাত্রছাত্রী জাপানে আসছে। চীন থেকে প্রতি বছর আসছে চার'শ ছাত্রছাত্রী।'

আপনাদের টিউশন ফি কত?

'এক বছরের টিউশন ফি একবারে দিতে হবে। এটার পরিমাণ প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ডলার।'

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এক বছরের পরিবর্তে ছয় মাসেরটা একবার নিতে পারেন না?

'সেটা হয়ত আলোচনা সাপেক্ষে নেয়া যেতে পারে।'

বাংলাদেশে স্কুল কবে নাগাদ শুরু করতে চান?

'আমি আগামী মাসে বাংলাদেশে যাব। যদি সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে এ বছরই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করতে চাই।'

এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে http://www.kokusho. co.jp ওয়েব সাইট দেখতে পারেন। অথবা baticromfod@yahoo.co.jp তে যোগাযোগ করতে পারেন।

জাপানের আইটি মার্কেটে বাংলাদেশীদের ঢোকার বেশ বড় সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেই। ভারতীয়রা ক্রমেই বাজার দখল করে নিচ্ছে। সম্প্রতি জাপানে এসেছেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার শাহনাজ জাহান সীমা ও এনামুল হক মিঠু। তাদের মতে, 'কম্পিউটার বিষয়ে পড়াশোনা করছে বাংলাদেশে এরকম জনশক্তি সংখ্যায় কম নয়। তবে জাপানে আসার ক্ষেত্রে ভাষা একটা সমস্যা। এখানে কাজ করতে হলে অবশ্যই জাপানি ভাষা জানতে হবে। ভারত দেশেই জাপানি ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা করে জনশক্তি পাঠাচ্ছে। এখানে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। আমাদের সরকারি পর্যায়ে উদ্যাগ নেয়া জরুরি। তা না হলে জাপানের পুরো মার্কেট ভারতীয়দের দখলে চলে যাবে।'

আমাদের সরকার বা দূতাবাস কোনো উদ্যোগ নেবে সেটা বিশ্বাস করা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব। জাপানের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো মাঝে মধ্যেই কম্পিউটার পরিবর্তন করে। এই কম্পিউটারগুলো বিভিন্ন দরিদ্র দেশের দূতাবাসগুলো সংগ্রহ করে দেশে পাঠায়। বাংলাদেশ দূতাবাস কখনো এমন কোনো উদ্যোগ নেয় না। এ বছর বাংলাদেশের কিছু ছাত্র যারা জাপানে পড়াশোনা করছে তারা কম্পিউটার সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছিল।

কবিতা আবৃত্তি করছেন ইফা ও আশিক

মেলার 'পরবাস' স্টলে সাপ্তাহিক ২০০০-এর ব্যানার

এরকমই একজন ছাত্র শাহেদ মনবসু স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে এসেছেন পাঁচ বছর আগে। শাহেদ জানালেন, ' আমরা নিজ উদ্যোগে কম্পিউটার সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু দেশে পাঠানোর জন্যে দূতাবাসের সহযোগিতা প্রয়োজন ছিল। সহযোগিতা না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত আমরা কম্পিউটার সংগ্রহ করিনি।'

টোকিও'র মতো পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল একটি শহরে বাংলাদেশের দূতাবাস যে কেন রাখা হয়েছে, সেটাই বড় প্রশ্ন। দূতাবাসকে নিয়ে প্রবাসীদের অভিযোগের শেষ নেই। প্রবাসীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার তো আছেই। উপরন্তু ঘুষ না দিলে নাকি সেখানে কোনো কাজই হয় না। দূতাবাসের অনেক কর্মচারী দেশ থেকে চাল-ডাল নিয়েও নাকি বিক্রি করেন। অভিযোগ আছে আরো অসংখ্য, যেগুলো নাই বা লিখলাম।

প্রবাসে এই দূতাবাসকেন্দ্রিক খারাপ খবর বাদ দিলে ভালো খবরের সংখ্যাই বেশি। 'পরবাস' জাপান প্রবাসী বাঙালিদের পত্রিকা। নতুন এই পত্রিকাটির সম্পাদক কাজী ইমানুল হক। তার মতে, 'বাঙালি কমিউনিটির একটি পত্রিকা থাকা প্রয়োজন। সেই তাগাদা থেকেই 'পরবাস' বের করেছি। প্রবাসের যান্ত্রিক জীবনের মাঝেও চেষ্টা করছি 'পরবাস'কে প্রবাসীদের মুখপত্রে পরিণত করতে। আমরা কিছু ভালো ছেলে ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি। আশা

করছি 'পরবাস' নিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো।'

রাহমান মনি, আরিফ মাসুদ ববি এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ববি থাকেন টোকিও থেকে দুই-আড়াই ঘন্টার দূরত্বে। সুযোগ পেলেই ছুটে আসেন টোকিও। গুম্মার ববি নামে পরিচিত তিনি। আবেগে টইটুম্বর ববি সতেরো বছর আগে জাপানে এসেছেন। এর মধ্যে একবারও দেশে আসা হয়নি। রাহমান মনির পুরো নাম মোঃ মোখলেসুর রহমান অনজু। মুন্সীগঞ্জের মাঠপাড়ার ছেলে রাহমান মনি হরগঙ্গা কলেজ থেকে ডিগ্রি পরীক্ষা দিয়ে জাপানে এসেছিলেন ১৯৮৫ সালে। '৯১ সালে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন জাপানিজ মেয়ে। '৯৮ সালে সংসার ভেঙে গেছে। দশ বছরের ছেলে রাহমান মাহিনুর আইকো (ইফা) সাত বছরের ছেলে রাহমান মোঃ আশিকুর হিরো আকি (আশিক)কে নিয়ে তার সংসার। ইফা এবং আশিক ভদ্র, নম্র, বয়সের তুলনায় অনেক ম্যাচিউর। মনি কখনো তাদের মায়ের অভাব বুঝতে দেননি। একজন আদর্শ বাবার প্রতিকৃতি রাহমান মনি। টোকিওর আকাবানের বড় সরকারি ফ্ল্যাটে থাকেন। চাকরি আর সন্তানদের দায়িত্ব পালন করার বিরামহীন সংগ্রাম করে এখন একটি অবস্থানে পৌঁছেছেন। মাঝখানে চাকরি ছেড়ে দিয়ে সন্তানদের নিয়ে দেশে চলে এসেছিলেন। ছেলে-মেয়ের জাপানি পাসপোর্ট হওয়ায় আমাদের আমলতান্ত্রিক জটিলতা আর ঘুষ কালচারের কবলে পড়ে আবার ফিরে গেছেন জাপানে। ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করছে জাপানি স্কুলে। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হলেও এখনো শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক মনির। শ্বশুর-শাশুড়ি উল্টো মেয়েকেই বের করে দিয়েছে বাড়ি থেকে। মনি সারাক্ষণ হাসি-খুশি থাকলেও হারানোর একটা হাহাকার লক্ষ্য করলে বোঝা যায়।

ডা. শেখ আলিমুজ্জামানের জাপানি স্ত্রীর চমৎকার বাঙালি রান্না ভুলতে কষ্ট হবে দীর্ঘদিন। আপাদমস্তক কবি প্রিন্স ভাই। কাজ করেন জাপানের বিখ্যাত cazetf প্রকাশনা সংস্থায় সম্পাদনা সহযোগী হিসেবে। পুরো বাংলাদেশকে একসঙ্গে বুকে ধারণ করে যাপন করছেন প্রবাস জীবন। সহকারী চলচ্চিত্র পরিচালকের কাজ করেন জুয়েল এমকিউ। নিজেও ইতিমধ্যে বেশকিছু প্রশংসনীয় ছবি বানিয়েছেন। একদা প্রবাসী এখন বাংলাদেশের শিল্পপতি আপেল ভাইসহ গিয়েছিলাম 'এঁদো মিউজিয়াম' দেখতে। এটা জাপানের ট্রেডিশনাল মিউজিয়াম। জুয়েল ভাই মিউজিয়ামসহ পুরো এলাকা ঘুরিয়ে দেখালেন। জাপানের পুরনো ঐতিহ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের রয়েছে অদ্ভুত মিল।

কাজী ইনসান, ববি এবং ছড়াকার বদরুল বোরহানের সঙ্গে চমৎকার একটা দিন কেটেছিল টোকিও আন্তর্জাতিক বইমেলায়। বইমেলায় যেতে দেখলাম সমুদ্রের একটা অংশকে কিভাবে শহর বানিয়ে ফেলেছে জাপানিরা। ব্যবসায়ী তসলিম ভাই নিয়ে গিয়েছিল সমুদ্রের নিচের টানেল দেখাতে। সাড়ে নয় কিলোমিটার লম্বা টানেল বানাতে সময় লেগেছে মাত্র দুই বছর। এই টানেল দিয়ে যাওয়ার পথেই সমুদ্রের মাঝে বিশাল বড় পাঁচতলা হোটেল বানিয়েছে। পর্যটকদের ঘুরে-বসে বেড়ানোর অবাধ ব্যবস্থা। চারদিকে সমুদ্র মাঝখানে হোটেল। সমুদ্রের নিচ দিয়ে টানেল, ওপর দিয়ে কয়েকতলা হাইওয়ে। বিষয়টি

'বাংলাদেশে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে জাপান আসার একটা ব্রিজ তৈরি হবে'

সাতো কি সাও

ভাবুন তো একবার! নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা বেশ কষ্টকর।

তসলিম ভাইয়ের সঙ্গেই গিয়েছিলাম বিখ্যাত ফুজি পাহাড়ে। টোকিও থেকে দূরত্ব আড়াই থেকে তিন ঘন্টা। ফুজি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। জেগে উঠলে আশপাশের অঞ্চল তো ধ্বংস হবেই- ধ্বংস হয়ে যাবে টোকিও'র একটি অংশও। এর জন্য রয়েছে জাপান সরকারের নানা আয়োজন। দ্রুত রাজধানী অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার প্রস্তুতিও রয়েছে সরকারের। গাড়ি নিয়ে ফুজি পাহাড়ে তিন হাজার মিটার পর্যন্ত উঠেছিলাম। বৃষ্টি আর শীতের কারণে পায়ে হেঁটে আর উপরে ওঠা সম্ভব হয়নি। ফুজি যাওয়ার পথের দু'ধারের প্রকৃতি অসম্ভব সুন্দর। জাপান মানে শুধু টোকিওর যান্ত্রিকতা নয় সেটা কিছুটা বোঝা গেলো।

মাহবুব ভাই, ভাবী আর তাদের দুই ছেলে-মেয়েসহ মাছের অ্যাকুরিয়াম আর সিল মাছের খেলা দেখতে যাওয়ার কথা মনে থাকবে অনেক দিন। শাহেদ নিয়ে গিয়েছিল সুমন ভাইয়ের বাসায়। সেখানে দেখা হলো বাংলাদেশ থেকে পিএইচডি করতে যাওয়া তন্ময় ভাই, ভাবী, দেলোয়ার ভাই, ফারুকসহ আরো অনেকের সঙ্গে। যেন প্রবাসে এক একটি ছোট্ট বাংলাদেশ।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভিসাসহ নাগরিক আইনি সহায়তা দিচ্ছে 'এশিয়ান পিপলস ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি' (এপিএফএস)। এই প্রতিষ্ঠানটি যার হাত দিয়ে গড়ে উঠেছে তাদের একজন কাৎসুও ইয়োশিনারী। এপিএফএস-এর সভাপতি কাৎসুও ইয়োশিনারীর সঙ্গে কথা হলো দীর্ঘক্ষণ। প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য কেন কাজ করছেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবাসি। যাদের ভিসা নেই তারা যাতে ভিসা পায় সেজন্য আমরা কাজ করছি। আমাদের উদ্যোগে ইতিমধ্যে বেশ কিছু বাঙালি ভিসা পেয়েছেও।'

এপিএফএস অফিসেই পরিচয় হলো একজন প্রবাসী বাংলাদেশীর সঙ্গে। আজ থেকে তেরো বছর আগে ভাগ্য তাকে নিয়ে এসেছিল জাপানে। দেশে রেখে গিয়েছিলেন স্ত্রী আর দু'সন্তান। আসার সময় তাদের বলেও আসেননি। এখন তার পর্যাপ্ত অর্থ আছে। বেশ বড় একটি হোটেলের মালিক তিনি এখন। তার হোটেলের পিজা খাওয়ালেন আমাদের। ভিসা নেই তাই তেরো বছরে একবারও দেশে আসা হয়নি। দেশে আসলে একেবারে চলে আসতে হবে। একদিকে ব্যবসা-অর্থ, অন্যদিকে স্ত্রী-সন্তান। এক অদ্ভুত দোটানায় আটকা পড়ে আছেন। এরকম প্রবাসীর সংখ্যাও কম নয়।

একটা চমৎকার সন্ধ্যা কেটেছিল জাহিদ, প্লাসিড, মিঠু, লিনাস প্রমুখের সঙ্গে আকাবানের ম্যাগডোনালস-এ। রাহমান মনি, ইফা, আশিক, কাকনের সঙ্গে ডিজনিল্যান্ডে দিন কেটে গিয়েছিল কিছু বুঝে ওঠার আগেই। সানাগাওয়ার অ্যাকুরিয়াম আর ডলফিনের খেলা তো বিস্ময়কর।

টোকিওর টেঙ্গু হোটেলে একত্রিত হয়েছিল জাপান প্রবাসী বাঙালিদের সবগুলো সংগঠনের প্রতিনিধিরা। ডা. আলিমুজ্জামান, বিমল দা, আসগর আহমেদ, কাজী ইনসান, রাহমান মনি, জাকির হোসেন, সুখেন ব্রহ্ম, আরিফ মাসুদ ববি, জুয়েল এমকিউ, জাকির হোসেন জোয়ার্দার, নাসিম-উজ-সালেহীন, আরিফ, সানি, প্রবীর বিকাশ সরকার, জালাল, ফয়সাল, মাসুদ, বাকের প্রমুখ। এক সঙ্গে এতোগুলো মানুষের ভালোবাসা আমি কোনোদিন ভুলবো না। ভোলা সম্ভব নয়।

জাপানিরা একটি বিস্ময়কর জাতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে আজ তারা কতটা উন্নত ভাবা কষ্টকর। জাপানিদের দেখলে মনে হয় তারা মোবাইল অ্যাডিকটেড জাতি। কিছুদিন আগের পরিসংখ্যান ছিল জাপানের সত্তর শতাংশ মানুষ মোবাইল ব্যবহার করে।

এখন সেই সংখ্যা আশি ছাড়িয়ে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ট্রেন ধরার জন্য দৌড়াতে দৌড়াতে, প্রচন্ড ভিড়ে ট্রেনের মধ্যেও তারা মোবাইল ব্যবহার করে। ট্রেনে যদিও মোবাইলে কথা বলা নিষেধ। এ কারণে ট্রেনে তারা মোবাইলে ই-মেইল চেক করে অথবা পাঠায়।

শুধু আমাদের কাছে নয়, পৃথিবীর যে কোনো দেশের মানুষের কাছে বিস্ময়কর জাপানিদের ট্রেন ব্যবস্থা। পুরো টোকিও জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে মাকড়সার জালের মতো ট্রেন ব্যবস্থা। মাটির নিচে স্তরে স্তরে সাত আটতলা পর্যন্ত সাবওয়ের ট্রেন লাইন। উপরে চার পাঁচ তলা পর্যন্ত। বুলেট ট্রেন চলে তিন চার তলা ওপর দিয়ে। সকালে দু'তিন মিনিট পরপর আর সারাদিন পাঁচ মিনিট পরপর বুলেট ট্রেন ছুটে যাচ্ছে জাপানের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। ভাড়া বিমানের চেয়েও কিছুটা বেশি। জাপানের ট্রেন সম্পর্কে বলা হয় কেউ প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে যদি রেল লাইনের ওপর ছাপ দেয় তাহলে নিশ্চিত সে কোনো না কোনো ট্রেনের কামরায় পড়বে। তার পক্ষে কোনোভাবেই রেল লাইনের ওপর পড়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ট্রেন। কেউ ট্রেনের নিচে আত্মহত্যা করলে বড় অঙ্কের জরিমানা দিতে হয় পরিবারের সদস্যদের। বাসস্থান টোকিওর যে কোনো অঞ্চলেই হোক না কেন আধা কিলোমিটারের মধ্যে কমপক্ষে একটি স্টেশন থাকবেই। এ কারণে জাপানের প্রায় সব মানুষ ট্রেন নির্ভর। টোকিওর মাত্র বিশ শতাংশ মানুষ গাড়ি ব্যবহার করে। গাড়ি ব্যবহার অসম্ভব ব্যয় বহুল। পার্কিং চার্জ অবিশ্বাস্য রকম বেশি। জাপানের জীবনযাপন ব্যয় অকল্পনীয়। জিনিস পত্রের দাম আকাশছোঁয়া। হাফ লিটার পানির দাম বাংলাদেশী পঁচাত্তর টাকা। ট্রেনের সর্বানিম্ন ভাড়া ১৩০ ইয়েন অর্থাৎ ৬৫ টাকা। প্রথম দুই কিলোমিটারের ট্যাক্সি ভাড়া ৬৬০ ইয়েন। পনেরো থেকে সতেরো মিনিটের দূরত্বে যেতে ট্যাক্সির মিটারে ওঠে ২২শ' থেকে ২৫ শ' ইয়েন।

জাপানিদের কাছে এখন আতঙ্কের নাম সার্স নয়, উত্তর কোরিয়া। আমেরিকা তাদের মগজে এই আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রায় প্রতিটি জাপানি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এটা ভেবে যে, এই বুঝি উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক মিসাইল জাপানে আঘাত হানল। একমাত্র আমেরিকাই তাদের বাঁচাতে পারে বলে মনে করে জাপানিরা। বর্তমানে আমেরিকার চারটি বেইজ রয়েছে জাপানে। টোকিওর রাস্তায় অহরহই চোখে পড়ে ইউএস আর্মি লেখা গাড়ি। আমেরিকান সৈন্যদের পেছনে প্রতি বছর কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে জাপান। মধ্যপ্রাচ্যের মতো জাপানও

'আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবাসি। যাদের ভিসা নেই তারা যাতে ভিসা পায় সেজন্য আমরা কাজ করছি'

কাৎসুও ইয়োশিনারী

আমেরিকার আয়ের একটি উৎস।

বাংলাদেশের মতো জাপানি মার্কেটও যেন দিন দিন চলে যাচ্ছে চীনের দখলে। জাপানে শ্রমের মজুরি বেশি। তাই জাপানের বড় বড় সব কোম্পানি চীনে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছে। সিটিজেন কোম্পানির জাপানে তৈরি যে ঘড়ির দাম ষোলো হাজার ইয়েন, চীনে তৈরি সেই ঘড়ির দাম ছয় থেকে সাত হাজার ইয়েন। শ্রমের মূল্যের পার্থক্যের কারণেই দ্রব্যের মূল্যে এমন তফাৎ।

দেখতে দেখতে কেটে গেল ১৬ দিন। এবার ফেরার পালা। গিয়েছিলাম বাংলাদেশ বিমানে। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। বিমানের দু'টি জিনিস প্রশংসিত। প্রথমত বাংলাদেশ বিমানের পাইলটরা খুব দক্ষ। দ্বিতীয়ত বিমানের খাবার মান ভালো। পাইলটরা ভালো এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু খাবারের মান নিয়ে সন্দেহ না থাকলেও খাবার সরবরাহ নিয়ে অনেক কথা আছে। বিমানে কোকাকোলা সরবরাহ করা হয় না। ট্রলিতে রাখা হয় শুধু ভার্জিন। কেউ কোক চাইলে বোঝানো হয় কোক এবং ভার্জিন কোলা একই। খাবারে শুধু দেয়া হয় চিকেন রাইস। কেউ প্রণ চাইলে হবে কিনা... ইত্যাদি কথা বলে টালবাহানা করা হয়। কোক এবং প্রণ বিষয়ে এটা আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা। অনেক কথার পর কোক এবং প্রণ আমাকে দেয়া হয়েছিল লুকিয়ে কেউ যাতে না দেখে এমনভাবে। এই লুকোচুরির কারণ কী? প্রচলিত আছে এয়ার হোস্টেস, পার্সার প্রমুখ একটি ফ্লাইটে গিয়ে কয়েকদিন টোকিওতে অবস্থান করেন। বিমানের এই খাবার দিয়েই তারা চালিয়ে দেন। বিমানের কোক তারা বাইরে বিক্রি করে দেন। প্রণ নিজেদের খাওয়ার জন্যে আর কোক বিক্রি করার জন্যেই তারা সরবরাহ করতে চান না। এমন কথা বিশ্বাস করতে না চাইলেও বাস্তব অবস্থা দেখে আমি অবিশ্বাস করতে পারিনি।

আমি নিজের চোখে ২৪ এপ্রিলের ফ্লাইটের চীফ পার্সারকে সারাক্ষণ পান করতে দেখেছি। অথচ বিজনেস ক্লাসের একজন বিদেশী একটি বিয়ার চেয়ে পেয়েছে আধাঘন্টা পরে। ঐ ফ্লাইটে কত বিয়ার ছিল, কত বোতল হুইস্কি ছিল, কোকসহ অন্যান্য জিনিস কী পরিমাণ ছিল আর কী পরিমাণ খরচ হয়েছে? এই হিসাব কোনো দিন কেউ করবে না। কারণ এটা ওপেন সিক্রেট। বিমানের প্রায় সবাই কমবেশি দুর্নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সেই বাংলাদেশ বিমানে ফেরা হলো না। ঝড়ে বিধ্বস্ত বিমান। ঢাকা-টোকিও ফ্লাইট বন্ধ তিন সপ্তাহ ধরে। বিমানের জাপানের কান্ট্রি ম্যানেজার এআরএম আজিজুর রহমান টিকেট পরিবর্তন করে দিলেন মালয়েশিয়ান এয়ার লাইনস-এ। বাংলাদেশ বিমানের তুলনায় মালয়েশিয়ান এয়ারলাইনসের ভাড়া অনেক কম। কিন্তু সেবার মান কয়েক গুণ ভালো। লেখা শুরু করেছিলাম সার্স আতঙ্ক দিয়ে। আবারও ফিরে আসতে হচ্ছে সার্স প্রসঙ্গে। নিজেদের ব্যর্থতা আর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে ঝড়ে বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার ফলে টোকিওর ফ্লাইট বন্ধ। নিজেদের এই ব্যর্থতা আড়াল করার জন্য বিমানের জনসংযোগ কর্মকর্তা জহিরুল হক নির্লজ্জ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, 'বিমান দুর্ঘটনার কারণে নয়, সার্সের কারণে টোকিও ফ্লাইট বন্ধ করেছে'।

মিথ্যা আর অসততার কী চমৎকার নিদর্শন!

২৫ এপ্রিল সকালে নারিতা এয়ারপোর্ট থেকে মাহবুব ভাই নিজের গাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন টোকিও। ১০ মে এয়ারপোর্টে নিয়েও এলেন তিনি। সঙ্গে আসলেন রাহমান মনি। আগেরদিন রাতে বিদায় নিয়েছিলাম ইনসান ভাই, প্রিন্স ভাই, জুয়েল ভাই-এর কাছ থেকে। মনটা তখন থেকেই খারাপ ছিল। সকালে এয়ার পোর্টের কাজ সেরে বিদায় মুহূর্তে হাজির হলেন তসলিম ভাই। মাহবুব ভাই, মনিভাই আর তসলিম ভাইদের ফেলে ঢুকে গেলাম এয়ারপোর্টের ভেতরে।

জানি যান্ত্রিক জীবনে আবেগের স্থান নেই। তারপরও কিছু ঘটনা এর থেকে আমাদের বেরুতে দেয় না। আমি কী কোনোদিন ভুলতে পারবো প্রবাসী বাঙালিদের এতো ভালোবাসার কথা! ভোলা কী সম্ভব ইউকোহোমার সেই ছেলেগুলোর কথা! যারা অনুষ্ঠানস্থল থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার দৌড়ে মঞ্চে উঠে এসেছিল শুধু আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য...!

ঠিক সকাল সাড়ে দশটায় উড়ে গেলাম। পেছনে পড়ে রইল ষোলো দিনের টুকরো টুকরো স্মৃতি...।